আলোচিত ঘটনা ২০০৪

বছরজুড়ে অনেক ঘটনা ঘটেছে দেশে। এর মধ্যে কোনোটি ইতিবাচক, কোনোটি আবার নেতিবাচক। সাপ্তাহিক ২০০০-এর বিশ্লেষণে বিদায়ী বছরে জাতীয় জীবনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলো...

২১ আগস্ট : রাজনীতির এক কলঙ্কিত অধ্যায়

২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলায় নিহত হয় আইভি রহমানসহ ২০ জন সাধারণ মানুষ। '৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে এতো খারাপ দিন আর আসেনি।

২১ আগস্টের আগে ২১ মে সিলেট শাহাজালাল মাজারে ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। সে ঘটনায় হাই কমিশনার বেঁচে গেলেও এটা ছিল বাংলাদেশের জন্য চরম আঘাত। এমন একটি ঘটনার পর সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আরও বেশি দায়িত্বের পরিচয় দেবে এটাই সবাই আশা করেছিল। কিন্তু তা হয়নি?

২১ আগস্ট ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের জনসভায়। এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। দেশের প্রধান বিরোধীদলীয় নেতার কর্মসূচিতে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকাটাই সঙ্গত। ঘটনার দিন প্রধান বক্তা হিসেবে শেখ হাসিনা যখন মাত্র বক্তৃতা শেষ করেছেন তখনই চারদিক থেকে মুহুর্মুহু গ্রেনেড আক্রমণ শুরু হয়। শেখ হাসিনা যে ট্রাকটির ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিলেন তার আশপাশে কয়েকটি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনাকে চারদিক থেকে ঘিরে থাকলে তিনি বেঁচে যান। শেখ হাসিনা বেঁচে গেলেও তার জনসভায় আসা দলীয় কর্মী ও নেতৃবৃন্দ নিহত হন। আহত হন কয়েকশ'। অনেকের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঢাকা মেডিকেলসহ প্রায় সবগুলো হাসপাতালে আহত আর নিহতের স্বজনদের আহাজারিতে বিস্বাদময় হয়ে ওঠে। শুধু গ্রেনেডের বিস্ফোরণই নয়, ঘটনার পর পর কারাগারের ভেতর ও আশপাশ থেকে বেশ কয়েকটি অবিস্ফোরিত গ্রেনেড উদ্ধার করে। যাতে আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়।

গ্রেনেড হামলার মধ্যেই শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা তাকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলেন। এ সময় নেত্রীকে বাঁচাতে

†M‡bW nvgjvi c‡i Gfv‡eB Qwo‡q wQwU‡q wQj AmsL¨ jvk

গিয়ে নিহত হয় ব্যক্তিগত দেহরক্ষী মাহাবুব। ঘটনার পরপরই সারা শহরের গাড়ি ঘোড়া দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের জীবনে নেমে আসে আরেক বিভীষিকাময় সময়। পুরো দেশ আতঙ্কের নগরীতে পরিণত হয়। সারা বিশ্বের নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনাকে বার্তা পাঠান। এমনকি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করার জন্য চিঠি পাঠান। কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পাওয়ায় এই উদ্যোগটি ভেস্তে যায়। ২১ আগস্ট সবগুলো টিভি চ্যানেল স্পেশাল বুলেটিন প্রচার করে। ব্যতিক্রম শুধু বিটিভি। তারা রাত ৮.৩০টার খবরে ঘটনাটি চেপে যায়। ১০.৩০ মিনিটে ইংরেজি খবরে গ্রেনেড হামলার ঘটনাটি দায়সারাভাবে প্রচার করে।

ঘটনার পর আওয়ামী লীগ আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানালেও সরকার এক সদস্যবিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করে। সেই সঙ্গে স্থানীয় পুলিশকে সহযোগিতার জন্য ইন্টারপোলকে আনা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্তও ২১ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে সরকার কোনো কিছু জানাতে পারেনি।

গ্রেনেড বা বোমা হামলার কালচার শুরু হয় আওয়ামী লীগের সময় থেকে। আজ পর্যন্ত কোনো ঘটনাই তদন্ত আলোর মুখ দেখেনি। ভবিষ্যতে দেখবে কি না কে জানে। বোমা বা গ্রেনেড হামলাকারীদের বিচার হয়নি বলেই বার বার তারা জনসভাতে বোমা ফাটানোর সাহস দেখিয়েছে। নির্বিচারে সাধারণ মানুষ হত্যা করেছে।

৩০ এপ্রিল : কথার রাজনীতি

একদিকে সন্ত্রাস, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অন্যদিকে দেশ জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতায় জনগণের নাভিশ্বাস ওঠার মতো অবস্থা। এ অবস্থায় গত বছরের নবেম্বরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল ঘোষণা দেন এ বছরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকারকে পদত্যাগ করতে

বাধ্য করা হবে।

জলিলের ঘোষণায় সারা দেশ চমকে ওঠে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা নানামুখী জটিল হিসাব-নিকাশে মেতে ওঠে। অন্যদিকে সরকারও জলিলের ঘোষণায় বিচলিত হয়ে পড়ে। দিনক্ষণ দিয়ে সরকার পদত্যাগ করানোর ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। 'কিসের ভিত্তিতে, কোন পথে সরকারকে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পদত্যাগ করবে'? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে আব্দুর জলিল বরাবরই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বলেছেন। কিন্তু আন্দোলন করে সরকার পতন সম্ভব নয়, তা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের মতো দলের সাধারণ সম্পাদক যখন একটি কথা বলেন তখন চিন্তার যথেষ্ট কারণ থাকে।

জলিলের ঘোষণার পর শুরু হয় কাউন্ট ডাউন। একই সঙ্গে জনগণের টেনশনের ব্যারোমিটার হতে থাকে উর্ধ্বমুখী। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শুধু ঘোষণা দিয়েই তারা বসে ছিল না। নানারকম কর্মসূচিও পালন করতে থাকে। ৩০ এপ্রিলের রেকর্ড জলিল বাজিয়ে গেলেও আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে খুব ভালো করে কিছু জানতো না। এমন কি শেখ হাসিনাও জনগণকে টেনশনমুক্ত করা থেকে বিরত থাকেন।

i¨ve I µm dvqvi G `wU kãB GLb Av‡jvPZ

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি যায় কিন্তু সরকার পতন করানোর মতো কোনো আন্দোলন চোখে পড়ে না। জলিল সময় মতো ট্রাম্প কার্ড ছাড়বেন বলে ঘোষণা দেন। সরকারের পতন ঘটবেই এ ব্যাপারে জলিলকে আত্মবিশ্বাসীও মনে হচ্ছিল তখন। কিন্তু তেমন কোনো আন্দোলন না থাকায় জনগণ গোপন কোনো ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছিল। মার্চে বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও বিএনপির দলীয় সাংসদ মাহি বি. চৌধুরী ও মেজর (অবঃ) মান্নান পদত্যাগ করলে কেউ কেউ সরকার পতনের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে ওঠেন। এমন কি বিএনপির মধ্যেও চরম অস্থিরতা দেখা দেয়। গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন বিএনপির সংসদ সদস্যদের ওপর নজরদারি শুরু করে। ৩০ এপ্রিল যত এগিয়ে আসছিল, ততই টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছিল দেশ জুড়ে। ধারণা করা হচ্ছিল সরকারি দলের একটি অংশের সঙ্গে বিরোধী দলের সমঝোতার প্রেক্ষিতে সরকারকে পদত্যাগ করানো হবে। কেউ কেউ সামরিক বাহিনীর ক্ষমতায় আশার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছিল না। সরকার মূলত এ সময় থেকেই সারাদেশে আওয়ামী লীগের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের গ্রেপ্তার শুরু করে। আওয়ামী লীগের অনেকগুলো কর্মসূচির মধ্যে একটি ছিল ২১ এপ্রিল হাওয়া ভবন ঘেরাও। সরকার এ সময় গণগ্রেপ্তারের উদ্যোগ নেয়। যাতে আওয়ামী লীগের কোনো নেতা-কর্মী ঢাকা পৌঁছাতে না পারে। পুরো ঢাকা শহর পুলিশের শহরে পরিণত হয়। রাজধানীতে প্রতিদিনই নিত্যনতুন গুজব ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সরকার ভয়ে অস্থিরতায় ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত গণগ্রেপ্তার অব্যাহত রাখে। হাজার হাজার সাধারণ মানুষ এ সময় গ্রেপ্তার হয়। এ সময় আওয়ামী লীগ একটি নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণেরও চেষ্টা করে। এ রকম একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ৩০ এপ্রিল অতিবাহিত হয়। জনগণ ও সরকার হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

৩০ এপ্রিল সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আব্দুল জলিল বলেন, আমি নির্দিষ্ট করে কিছু

'ক্রসফায়ার'

এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত শব্দ ক্রসফায়ার। দেশের এলিট ফোর্স র‍্যাব। তাদের অপারেশন শুরু করার পর সন্ত্রাসীরা এখন ক্রসফায়ারের ভয়ে যে যেখানে পারে গা ঢাকা দিয়েছে। যারা জেলহাজতে আছে তারাও ভয়ে জামিন নিয়ে বেরিয়ে আসছে না। আগে র‍্যাবের হাতে ধরা পড়লে সন্ত্রাসীরা হার্ট অ্যাটাকে মারা যেতো। সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নানকে দিয়ে ক্রসফায়ার নাটকের শুরু। দেশের অন্যতম শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নানকে র‍্যাব সাভারের একটি প্রাইভেট ক্লিনিক থেকে গ্রেপ্তার করে। বড়মাপের সন্ত্রাসী গ্রেপ্তারের পর র‍্যাবের ভাবমূর্তি কিছুটা উজ্জ্বল হয়। গ্রেপ্তারের ৪ দিন পর ৬ আগস্ট আশুলিয়ার কাছে ক্রসফায়ারে নিহত হয় দেশের অন্যতম শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নান। পিচ্চি হান্নানের পর ঐ মাপের সন্ত্রাসী আর গ্রেপ্তার না হলেও সারা দেশেই ছোট বড় ৫৭ জন সন্ত্রাসী ক্রসফায়ারে নিহত হয়। কিছুদিন আগে- নিষিদ্ধ ঘোষিত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা মোফখখর চৌধুরী র‍্যাবের ক্রসফায়ারে নিহত হয়। কুষ্টিয়া অঞ্চলের আরেকজন বিখ্যাত সন্ত্রাসী নেতা মফিজও তাদের ক্রসফায়ারে নিহত হয়।

আলোচিত ক্রসফায়ারে দেশে সন্ত্রাসের হার কমে গেছে সত্য। কিন্তু আলোচিত এই শব্দটি নিয়েও প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। প্রতিটি ঘটনাতেই দেখা যায়, র‍্যাব অস্ত্র উদ্ধার করতে গেছে আর সন্ত্রাসীরা তাদের সঙ্গীকে ছাড়িয়ে নিতে র‍্যাবের ওপর গুলি ছুঁড়েছে। সে ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারকৃত আসামি গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে। যে জায়গায় অস্ত্র যুদ্ধ হচ্ছে সেসব জায়গা থেকে র‍্যাব ভাঙা পাইপগান, বুলেট, খুব বড় জোর কোনো বিদেশী পিস্তল উদ্ধার করেছে। সম্প্রতি র‍্যাবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে পুলিশের সদস্যদের নিয়ে গঠিত চিতা ও কোবরা নামের আর দুটি এলিট ফোর্স। ক্রসফায়ারের ঘটনা তাদের ক্ষেত্রেও ঘটছে। সন্ত্রাসীরা ধরা পড়ছে, র‍্যাবের আন্তরিকতাও এ ব্যাপারে প্রমাণিত। কিন্তু সন্ত্রাসীরা ধরা পড়ছে, সেই তুলনায় অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে না। আবার এসব সন্ত্রাসীদের যারা লালন পালন করতো তারাও থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। আপাতত সন্ত্রাসী ঘটনা কমে আসছে ক্রসফায়ার আতঙ্কে। কিন্তু এটা তো কোনো সমাধান নয়। যাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তাদের পৃষ্ঠপোষকদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে না পারলে কোনো লাভ হবে না। আজকে পৃষ্ঠপোষকদের ধরা না গেলে তারা নতুন নতুন পিচ্চি হান্নান জন্ম দেবে। তাদের হাতে আছে অর্থ, অস্ত্র ও ক্ষমতা। হার্ট অ্যাটাকের পরে ক্রসফায়ারের পরে কোন ফায়ার উদ্ভাবিত হবে কে জানে? তবে সত্যি বলতে ক্রসফায়ার শব্দটি জনগণের মনে নিরাপত্তার স্বস্তি এনে দিয়েছে। এই স্বস্তি কতদিন থাকে সেটাই দেখার বিষয়।

ক্রসফায়ারের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। র‍্যাবের সঙ্গে ক্রসফায়ারে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, নিষিদ্ধ ঘোষিত সকল দলের সন্ত্রাসীরা মারা গেছে। কিন্তু জামায়াতের সন্ত্রাসীরা অস্ত্রসহ ধরা পড়লেও ক্রসফায়ারের ঘটনা তাদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। বিষয়টি একটি বড়সড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলিনি, সাংবাদিকরাই ৩০ এপ্রিলের ডেডলাইন তৈরি করেছিল।

৩০ এপ্রিল সরকার পতন হয়নি, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি সত্য। কিন্তু এই একটি তারিখ নিয়ে রাজনীতিতে যে রকম টেনশন তৈরি হয়েছিল এবং সাধারণ মানুষের যে হয়রানি হয়েছে বিগত অনেক বছর এ রকম ঘটেনি।

বিকল্প ধারা : রাজনীতিতে নয়া মেরুকরণের প্রচেষ্টা

এ বছরই রাজনৈতিক অঙ্গনে বিকল্প ধারার আত্মপ্রকাশ। ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী এই দলের প্রধান। ২০০৩ সালে জিয়াউর রহমানের মাজারে ফুল দিতে না যাওয়া নিয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি বি. চৌধুরীর সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এক সময় তাকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকেও বিদায় নিতে হয়। বি. চৌধুরীর জন্য এটা ছিল চরম অপমান। রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করার পর তিনি চুপচাপ ছিলেন। হঠাৎ করেই তিনি এ বছর নড়াচড়া শুরু করেন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন বি. চৌধুরী। সারা দেশে তার পরিচিতি আছে। ভালো রাজনীতিবিদ হিসেবে সুনামও আছে। তিনি রাজনৈতিক দল করার উদ্যোগ নিলে সবাই খুব আশাবাদী হয়ে ওঠে। অন্তত তার নেতৃত্বে একটি সুন্দর সুস্থ রাজনৈতিক দল ও কালচার গড়ে উঠবে বলে ভাবছিল। রাজনীতিতে আসছেন খবর শুনেই তার বারিধারাস্থ ক্লিনিকে বিভিন্ন পেশার লোকজন দেখা করতে থাকে। পত্র-পত্রিকাগুলোও তাকে ভালো কাভারেজ দেয়।

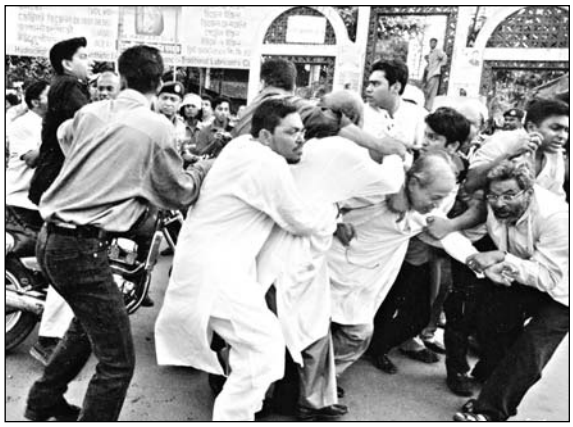

জনসভা করে যতটুকু প্রচার পেতো, সন্ত্রাসীদের আক্রমণের ফলে তার চেয়ে বেশি প্রচার পায় বিকল্পধারা

তিনিও জলিলের মতো চমক দেখানোর কথা বলেন। বিকল্পধারায় তার নেতৃত্বে সরকারি দলের অনেকেই যোগ দিচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছিল। এ খবর জানার পর থেকে কেসি মেমোরিয়ালসহ সকল নেতৃবৃন্দের ওপর গোয়েন্দারা কড়া নজরদারি শুরু করে। এ সময় আবার আওয়ামী লীগের ৩০ এপ্রিল ডেডলাইনের ঘোষণা ছিল। সব মিলিয়ে সরকার ছিল বেশ চাপে। এ সময় রাজনৈতিক অঙ্গনে জোর আলোচনা ছিল কারা কারা বি. চৌধুরীর সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। ২০০৩ সালের রোজার মাসে এক ইফতার পার্টিতে তিনি নতুন দল করার ইঙ্গিত দেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব রাজনৈতিক দল বি. চৌধুরীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। ২০০৩ সালে রাজনৈতিক দলের ইঙ্গিত দিলেও ১১ মার্চ তিনি তার পার্টির ঘোষণা দেবেন বলে সাংবাদিকদের জানান। অনেক হেনস্থার পর জনসভা করার অনুমতিও পান। ১০ মার্চ জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন মাহি বি. চৌধুরী ও মেজর (অবঃ) মান্নান। সে দিনই বিকেলে কেসি মেমোরিয়ালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তারা বি. চৌধুরীর সঙ্গে যোগদানের ঘোষণা দেন। এই ঘটনায় মাহি বি. চৌধুরীর তেমন কোনো ক্ষতি না হলেও সরকার ও সরকার দলীয় সমর্থকদের রোষানলে পড়ে মেজর মান্নান ও তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সরকারি নির্যাতন নেমে আসে তার ওপর। ১১ মার্চ জনসভাস্থলে আসার পথে বি. চৌধুরীকে সারা পথে বাধা দেয়া হয়। সব বাধা অতিক্রম করে তারা মহাখালী পৌঁছানোর পর সরকার দলীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা বি. চৌধুরীর গায়ের ওপর মোটসাইকেল তুলে দেয়। সন্ত্রাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হয় মাহি বি. চৌধুরী ও মেজর মান্নান। তারা জনসভা না করে ফিরে যায়। এই ঘটনায় সারা দেশে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পত্রপত্রিকা সাধারণ মানুষ সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। বি. চৌধুরী জনসভা করে যতটুকু প্রচার পেতো, সন্ত্রাসীদের আক্রমণের ফলে তার চেয়ে বেশি প্রচার পায় বিকল্পধারা।

এরপর ঢাকা-১০ ও মুন্সীগঞ্জের উপনির্বাচনে বিকল্পধারা প্রার্থী ঘোষণা করে। মুন্সীগঞ্জে আগের মতোই মাহি বি. চৌধুরী জিতে আসেন। কিন্তু মূল সমস্যা বাধে ঢাকা-১০ আসন নির্বাচনে। মেজর মান্নানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মোসাদ্দেক হোসেন ফালু। এই নির্বাচনেও বিএনপি হার্ড লাইনে যায়। অনেক রকম ঝামেলার জাল ভোট আর পেশিশক্তির কাছে হেরে যায় মেজর মান্নান। ঢাকা-১০ উপ-নির্বাচন যে সুষ্ঠু হয়নি সে কথা প্রায় সকল ভোট পর্যবেক্ষকরাই স্বীকার করেছিল। নির্বাচনের পর থেকে এ পর্যন্ত বিকল্পধারা তেমন কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করেনি। এমনকি ওই অর্থে রাজনীতির মাঠেও তারা নেই। পুরো বছর আলোচনায় থাকলেও শেষ দিকে তারা ম্রিয়মাণ। তারপরও আগামী দিনের নির্বাচনী রাজনীতি বিকল্পধারা একটি ফ্যাক্টর হবে বলে ধারণা করা হয়।

হুমায়ুন আজাদের বিদায়

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মুক্তচিন্তার লেখক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা

ûgwqb AvRv`

বিভাগের অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ঘাতকদের হামলায় গুরুতর আহত হন।

বাংলা একাডেমী বইমেলা থেকে রাতে বাসায় ফেরার পথে ঘাতকরা চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে ও বোমা মেরে তাকে হত্যার চেষ্টা চালায়। সৌভাগ্যক্রমে তিনি গুরুতর আহত হয়ে প্রাণে বেঁচে যান।

ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল এবং সিঙ্গাপুরে দীর্ঘ চিকিৎসা শেষে তিনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। সুস্থ হয়ে হুমায়ুন আজাদ জার্মানিতে গিয়েছিলেন ১ বছরের একটি ফেলোশিপ নিয়ে। জার্মানি পৌঁছার কিছুদিন পরেই ১৩ আগস্ট রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। পরিবারের দাবি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয়, হার্ট অ্যাটাকে তিনি মারা গেছেন। এভাবেই সুদূর জার্মানির নির্জন ফ্ল্যাটে দুঃখজনকভাবে বিদায় নিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের এক বর্ণাঢ্য চরিত্র।

ইতিহাসের বৃহত্তম অস্ত্রের চালান আটক

আব্দুল জলিলের ডেডলাইন ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকারের পতন ঘটানো হবে। ডেডলাইন নিয়ে সারা দেশের শঙ্কা আর আতঙ্ক বিরাজ করছিল এ সময় আরো একটি ঘটনা ঘটে। ১ এপ্রিল মধ্যরাতে চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্র আটক। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কখনো এতো মারণাস্ত্র আটক হয়নি। এ ঘটনায় সারা দেশে তোলপাড় শুরু হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরের স্নায়ু কেন্দ্র সিইউএফএল জেটিতে আটক হয় ইতিহাসের বৃহত্তম এই অবৈধ অস্ত্রের চালান। অস্ত্র যখন এই জেটিতে খালাস হচ্ছিলো তখন সিইউএফএলের নিরাপত্তাকর্মীরা পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সেখানে গিয়ে শুধুই অস্ত্র আটক করে, অস্ত্র চোরাচালানিরা পালিয়ে যায়। যে সব ট্রাকে এসব অস্ত্র বোঝাই হচ্ছিল, সেসব ট্রাকের ড্রাইভারদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কয়েক হাজার গ্রেনেড, রাইফেল, মর্টার শেলসহ নানা ধরনের অস্ত্র দেশের মধ্যে কিভাবে প্রবেশ করলো সেটা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। এতো বড় অস্ত্রের চালান আটক হওয়ায় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ সারা বিশ্ব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। পরে ঘটনার তদন্তে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু সেই কমিটি তদন্ত করে কি পেয়েছিল দেশ তা জানে না। সরকারও জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি।

সিলেটে বোমা হামলা এবং আহত ব্রিটিশ হাইকমিশনার

২০০৪ সালে সিলেটে কয়েক দফা শক্তিশালী বোমা হামলা হয়েছে। গত ১২ জানুয়ারি রাতে শাহজালাল (রঃ)-এর মাজারে বার্ষিক ওরস চলাকালে সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণে ৫ জনের মৃত্যু হয়। আহত হয় অসংখ্য দর্শণার্থী।

এই বোমা হামলার তদন্তে কোনো কূলকিনারা না হতেই ২১ মে দ্বিতীয় দফা বোমা হামলা হয় শাহজালাল (রঃ)-এর মাজারে। এবার ৬ জনের মৃত্যু হয়। ধারাণা করা হয়, এ হামলা চালানো হয়েছিল বাংলাদেশে নবনিযুক্ত বাঙালি (সিলেটের ছেলে) হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী ওপর।

তিনি আহত হয়ে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। এরপর ব্রিটিশ গোয়েন্দারা এসেও তদন্ত করে কিন্তু হামলাকারীদের আজ পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পারেনি দেশী-বিদেশী গোয়েন্দরা। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত একজন বিদেশী কূটনীতিকের ওপর এই ন্যক্কারজনক হামলায় দেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়। এর পরও আরো তিন দফা হামলা হয়েছে সিলেটের বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু কোনো অপরাধী ধরা পড়া দূরে থাক, শনাক্তই হয়নি।

মানববন্ধন-প্রতিবাদের বিকল্প ভাষা

বছরের সর্বাধিক আলোচিত ১০টি ঘটনার মধ্যে একমাত্র ইতিবাচক ঘটনা বিরোধী জোটের বছর শেষে মানববন্ধন কর্মসূচি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আমরা দেখে আসছি, যে যখন বিরোধী দলে থাকে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কথায় কথায় হরতাল ডাকে। এতে মানুষের দুর্ভোগ যেমন বাড়ে, তেমনি এই গরিব দেশের দুর্বল অর্থনীতির জন্য এ এক চরম অভিশাপ। দেশের ভেতরে এবং বাইরে নানা জায়গা থেকে হরতালের বিকল্প কর্মসূচি দেয়ার জন্য উৎসাহ দেয়া হচ্ছিল বিরোধী দলকে। শেষ পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও বাম দলগুলোসহ ১৪টি দল টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ৯৫৪ কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে মানব বন্ধনের ডাক দেয়। একটি গবেষণায় দেখা যায়, গত ৩২ বছরে বিরোধী দলগুলো প্রায় ৩ বছর হরতাল পালন করেছে।

হরতাল-ভাঙচুরের রাজনীতিতে সারা দেশের মানুষ যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তখন বিরোধী দলের এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিকে দেশী-বিদেশী সব মহল থেকেও সাধুবাদ জানানো হয়েছে। এ কর্মসূচির সাফল্যে উৎসাহিত বিরোধী জোট আগামী ৩০ ডিসেম্বর আরেকটি মানববন্ধনের ডাক দিয়েছে।

বন্যা ও অতিবৃষ্টি

গত জুলাই মাসের প্রথম থেকে শুরু হয়েছিল অতিবৃষ্টি। এর সঙ্গে সীমান্তের ওপার থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে দেশের সিংহভাগ এলাকা পানির নিচে চলে যায়। দেশের বিভিন্ন জেলার প্রায় ৪ কোটি মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়ে। রাজধানী ঢাকাসহ প্রায় ৪৫টি জেলার মানুষ কয়েক সপ্তাহ পানিবন্দি থাকে। তবে এই বন্যা প্রায় ২ মাস দীর্ঘায়িত হয়।

GKwU eb¨vZ cwievi

বন্যা শেষ হতে না হতেই স্মরণকালের অতিবৃষ্টিতে আবার ডুবে যায় প্রায় পুরো দেশ। রাস্তা, ব্রিজ কালভার্টের ব্যাপক ক্ষতির পাশাপাশি ফসল, বাড়ি-ঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সব ধরনের অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়।

বন্যা-পরবর্তী সময়ে সরকার বলেছে, ৪০

‘হাওয়া ভবন’ বছরজুড়ে আলোচনায়

Zv‡iK ingvb

২০০০ সালের সাধারণ নির্বাচনের বছরখানেক আগে থেকেই দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে হাওয়া ভবন। নির্বাচনে বিএনপি জোটের বিপুল বিজয়ের পর ক্ষমতা এবং দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় হাওয়া ভবনের হাতে। সরকারের যে কোনো পর্যায়ে এখন উঠতে-বসতে শোনা যায় হাওয়া ভবনের দোহাই। কোথাও কোথাও দুর্নীতিপরায়ণরা অপকর্ম সহজীকরণের জন্য অবলীলায় হাওয়া ভবনের দোহাই দিয়ে যাচ্ছে। সব ক্ষেত্রে হাওয়া ভবন এসব ব্যক্তি ও লেনদেনের সঙ্গে জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখার বিষয়। তবে বাজারে চালু আছে হাওয়া ভবনের সুপারিশ ছাড়া কিছুই হয় না। মানুষ এটা বিশ্বাস করছে এটাই মূল বিষয়।

বিরোধী দলগুলো থেকে মাঝেমধ্যে হাওয়া ভবনের অনিয়ম নিয়ে কথা বলতে শোনা যায়। কিন্তু তা শুধু মঞ্চের রাজনৈতিক বক্তৃতায় সমীবদ্ধ, কোনো তথ্যপ্রমাণ তারা উপস্থাপন করেনি। যদিও তারা দাবি করছেন, তাদের কাছে প্রমাণ আছে এবং তা সময় মতো জাতির সামনে পেশ করা হবে।

ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে গত ২১ আগস্ট হাওয়া ভবন ঘেরা ও কর্মসূচি দেয়া হয়। সেদিন পুলিশ এবং বিডিয়ার দিয়ে পুরো বনানী এলাকা অবরুদ্ধ করে ফেলে।

বনানী অবরুদ্ধ করে রাখার ফলে পুরো ঢাকা এ রকম যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এর মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর দুই পুত্র তারেক রহমান এবং আরাফাত রহমান হাওয়া ভবনে ভোজন ও ক্রিকেট খেলার আয়োজন করে। এটা রাজনৈতিক মহলে বেশ সমালোচিত হয়।

হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে এই বন্যা ও অতিবৃষ্টিতে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক বলেছিল ১৫ হাজার কোটি টাকার কথা।

দ্রব্যমূল্যের দুর্যোগ

বন্যা, অতিবৃষ্টির পাশাপাশি এ বছরের আরেক দুযোর্গের নাম দ্রব্যমূল্য। বর্তমান সরকারের পুরো সময়টাই বাজার ছিল উর্ধ্বমুখী। এখন পর্যন্ত ও এ ধারা অব্যাহত আছে সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে গত তিন বছর ব্যর্থ হয়েছে।

বন্যা এবং বন্যা-পরবর্তী সময়ে দ্রব্যমূল্য মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। পবিত্র রমজান মাসে বেগুনের কেজি ৮০ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। কাঁচা মরিচের মূল্য ২০০ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। রোজার মাসে লাগামহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনগণকে চূড়ান্ত বিপদসীমায় ঠেলে দিয়েছিলো।

বন্যার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জোগান কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসাধু ব্যবসায়ীরা মজুতদারি করে কৃত্রিম সংকট তৈরির ফলে দ্রব্যমূল্য চলে যায় মানুষের নাগালের বাইরে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া রোধে ব্যর্থতার দায় দেখিয়ে তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর মন্ত্রিত্ব কেড়ে নেয়া হয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয় ব্যর্থ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে। কিন্তু কথামালার উন্নয়ন ছাড়া বাজার পরিস্থিতির কোনো উন্নয়ন হয়নি।

আদালত অবমাননার দায়ে আইজিপি অপসারণ

গত বছর (২০০৩) দায়িত্ব পালনকালে পুলিশের কয়েকজন সার্জেন্ট হাইকোর্টের বিচারপতি এ এইচ শামসুদ্দিন চৌধুরীকে সম্মান না জানানোয় ২৬ জুন তিনি ৫ পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করেন। এ রুল শুনানির সুবিধার জন্য রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা এবং মর্যাদাশীলদের সম্মান দেখানোর বিষয়ে জানাতে হাইকোর্ট আইজিপির প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু রুলের জাবাবে আইজিপির দাখিল করা বক্তব্য অবমাননাকর মনে হওয়ায় হাইকোর্ট তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনেন।

এরপর আদালতের নির্দেশে আইজিপি শহুদুল হক সশরীরে হাইকোর্টে হাজির হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু শুনানি শেষে গত ২৭ জানুয়ারি শহীদুল হককে আদালত অবমাননার দায়ে ২ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১ মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। এ রায়ের পর শহুদুল হক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন করলে গত ৭

AcmZ AvBwRwc kû` j nK

ডিসেম্বর আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন।

আদালত অবমাননা মামলায় সাজা হওয়ায় ১৯৮৫ সালের দ্য পাবলিক সার্ভেন্টস (ডিসমিশাল কনডিকশন) অর্ডিন্যান্সের ৩ ধারা অনুযায়ী তিনি চাকরি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত বলে গণ্য হন। এরপর সরকার ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার আশরাফুল হুদাকে পুলিশের মহাপরিদর্শক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়।

বাংলা ভাইয়ের বিকল্প সরকার!

এক সময়ের স্কুলশিক্ষক আজিজুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই। রাজশাহী অঞ্চলের সর্বহারাদের খতম করার দায়িত্ব হাতে নিয়েছে সে। সর্বহারা দমনের নামে একের পর এক মানুষ খুন করেছে বাংলা ভাই বাহিনী। এরপরও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা পর্যন্ত এ সন্ত্রাসী বাহিনীর কর্মকান্ডের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। পত্রপত্রিকায় বাংলা ভাই বাহিনীর যখন-তখন মৃত্যুদন্ড দেয়ার মতো

বাংলা ভাই

নির্মমতার সচিত্র অনেক ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ প্রদানের পরও বাংলা ভাই এখনো পর্যন্ত বহাল তবিয়তে আছেন।

আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যাকান্ড

আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ এবং জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আহসানউল্লাহ মাস্টার সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে নিহত হয়েছেন গত ৭ মে। তার টঙ্গীর বাসভবনের সামনে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন চলাকালে আলোড়ন সৃষ্টিকারী হত্যাকান্ডটি সংঘটিত হয়। আহসানউল্লাহ মাস্টারের মতো একজন সৎ এবং ত্যাগী নেতার দুর্ভাগ্যজনক হত্যাকান্ডে পুরো দেশের মানুষ নিন্দা জানায়। এরপর ব্যাপক ভাঙচুরের ফলে টঙ্গী এবং গাজীপুর এলাকা কয়েক দিন অচল হয়ে পড়ে। এই খুনের ফলে শূন্য হওয়া সংসদীয় আসনের

আহসানউল্লাহ মাস্টার

উপনির্বাচনে তার পুত্র রাসেল সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

উত্তরবঙ্গের মঙ্গা

প্রত্যেক বছরের মতো এবারও উত্তরবঙ্গের লাখ লাখ মানুষ মঙ্গার শিকার হয়েছে। কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর প্রভৃতি জেলার মানুষ এমনিতেই দারিদ্র্যপীড়িত। উত্তরাঞ্চল এমনিতেই সরকারি সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত। ঐ এলাকায় কোনো কলকারখানা গড়ে ওঠেনি। তারপর চরাঞ্চল হওয়ায় ফসল ও তেমন হয় না। এ কারণে প্রতি বছর আশ্বিন-কার্তিক মাসে মঙ্গা দেখা দেয়। মানুষের হাতে কাজ না থাকায় পকেটে টাকা বা পেটে খাবার কোনোটাই থাকে না। প্রতি বছর মঙ্গা শুরু হলে সরকার ত্রাণ দিয়ে মানুষগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি কোনো সমাধানের উদ্যোগ নেই।

ঐ এলাকার মানুষের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করার কোনো উদ্যোগ সরকারি বা বেসরকারি কোনো পর্যায় থেকে নেই।